* * *

'স্তনদায়িনী' গল্পটি 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৭৯) সংকলনের উল্লেখযোগ্য গল্প। এই সংকলনের 'সাঁঝ-সকালের মা', 'হারুন সালেমের মাসি', 'যমুনাবতীর মা', 'মাদার ইণ্ডিয়া' এবং 'স্তনদায়িনী' গল্পের মধ্য দিয়ে জননী জীবনের প্রতি গল্পকারের সহমর্মিতা এবং নিজস্ব অভিব্যক্তি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। এই গল্প সংকলনে মোট সতেরটি গল্প স্থান পেয়েছে, এই সংকলনের ষোল সংখ্যক গল্প 'স্তনদায়িনী'। গল্পটির রচনাকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ/১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ। গল্পটির ইংরাজীতে নামকরণ হয়েছে 'Breast Giver'। গল্পটি প্রসঙ্গে গল্পকার জানিয়েছেন— 'স্তনদায়িনী' কাহিনীটি স্তনে ক্যানসারগ্রস্থ এক হতভাগিনীকে দেখে লেখা। নিজের সন্তানদের সঙ্গে সে এক ধনী পরিবারের শিশুদের দুধ দিত 'দুধমা' হয়ে পেটের জন্য। অত্যধিক স্তন্যদানই বুকে ক্যানসারের কারণ হয়তো নয়। কিন্তু স্তনে ক্যানসার অত্যধিক স্তন্যদান ক্ষেত্রেও দেখা যায়। অবশ্য গল্পটি লেখার কালে ডাক্তারদের সঙ্গে কথাও বলি এবং যৎসামান্য পড়াশুনাও করি।" লেখিকার এরূপ মন্তব্য গল্পপ্রিয় পাঠককে এক অনাস্বাদিত জীবনবোধ উপহার দিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

'স্তনদায়িনী' গল্পের কাহিনীভাগ করুণ ও মর্মস্পর্শী। গল্পকার মহাশ্বেতাদেবী জননী জীবনের এক দুর্বিষহ জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেছেন এই গল্পে। কাঙালি আর যশোদার জীবন বঙ্গদেশে দুরনীরিক্ষণ নয়, প্রতিক্ষণেই গ্রাম-বাংলায় হতদরিদ্র কাঙালি ও যশোদা পরিদৃশ্যমান। কবির কথায় "অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" না প্রলয় বন্ধ থাকে না। কাঙালি আর যশোদার জীবন সুখের বা শান্তির ছিল না ঠিকই কিন্তু হালদার বাবুদের ছোটছেলের স্টুডিবেকার কাঙালির পায়ের পাতা আর গোড়ালি চাপা দিলে যশোদার জীবন নতুন খাতে বইতে শুরু করে। কাঙালিকে হালদারবাবু হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় চিকিৎসার জন্য এবং অন্যদিকে পারিবারিক উপার্জনের লক্ষ্যে যশোদার জীবনে নতুন কর্মসংস্থান হয়ে যায় 'দুধমা' হিসেবে। যদিও কাঙালিকে যখন হালদার বাড়ির ছোটছেলের স্টুডিবেকার চাপা দিয়েছিল তখন হালদারকর্তা কাঙালির সংসার প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু হালদার কর্তার অকাল প্রয়ানে সেই প্রতিশ্রুতি কার্যত ব্যর্থ হয় এবং যশোদা হয়ে ওঠে হালদার বাড়ির 'দুধমা'। স্বামী-সন্তানের অন্নসংস্থানের জন্য যশোদা হালদারবাড়ির 'দুধমা' হতে সম্মত হয়ে যায়, যা তাকে মৃত্যু-পরিনামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যশোদা হালদার বাড়ির 'দুধমা' হওয়ার প্রস্তাবে যৎপরনাস্তি প্রীত হয়েছিল। "যশোদা তাঁর প্রস্তাবে হাতে মস্ত্রিত্ব পেল। নিজের স্তন দুটিকে বড়ে মহার্ঘ মনে হল তার। রাতে কাঙালিচরণ খুনসুড়ি করতে এলে সে বলে, 'দেখ। এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝে শুনে ব্যবহার করবে।" কাঙালিচরণ "...পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সেকথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতী লক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেল ধরবি, বুকে পালন করবি,...।"

কাঙালিচরণ এবং যশোদা এর পরেই যথাক্রমে পেশাদারি পিতা এবং পেশাদারি মা হয়ে ওঠে। হালদার বাড়িতে যশোদার আদর-আপ্যায়ণ ভালোভাবে চলতে থাকে, যশোদা পি ডব্লু অফিসারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে কিন্তু ভাবতে পারে না নিজের ভবিতব্যের পরিণাম। 'দুধ মা' হয়ে দুধ সরবরাহের জন্য, স্বামী কাঙালিচরণকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এবং সর্বোপরি হালদার বাড়ির বউদের শারীরিক সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রাখার আন্তরিক প্রয়াসে যশোদা তিরিশ বছরে কুড়িবার আঁতুড়ে ঢুকেছে, কুড়িটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এরপর হালদার বাড়িতে আর নবজাতকদের আবির্ভাব ঘটল না, হালদার গিন্নি মারা গেলেন, হালদার বাড়ির ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় উঠে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো, যশোদা দুধ মা থেকে কাজের লোকে পরিণত হল। কুড়িটি সন্তানের জন্ম দিয়েও কাঙালি যশোদার দায়িত্ব নিলো না অগত্যা তার স্থান হলো হালদার বাড়ির বড় বউ-এর কাজের লোক হিসেবে। এর পরেই যশোদা অসুস্থ হয়ে যায়, তার দেহ এলিয়ে পড়ে, তার বাম স্তনের উপর লাল মত দাগ দেখা যায় যা ক্রমে ক্ষততে পরিণত হয়, পরে জানা যায় যশোদার স্তন ক্যানসার হয়েছে। কয়েকদিনের চিকিৎসা ও অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর যশোদা হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কেউ তার

Scanned by CamScanner

মুখাগ্নি করে না। "বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধব একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল।" ডোমই যশোদাকে দাহ করলো— এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

'স্তনদায়িনী' গল্পের কাহিনী আসলে যশোদার 'দুধ মা'র কাহিনী। একটি সহায়-সম্বলহীন নারী কীভাবে স্বামী-সন্তানের কল্যাণে ক্ষুণ্ণবৃত্তির প্রয়োজনে নিজে আত্মবলিদান দিয়েছে— এই কাহিনী তারই স্মারক। এই কাহিনী মিশ্ররীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে— বর্ণনাত্মক রীতি এবং সংলাপ রীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। গল্পের কথাবস্তু ধাপে ধাপে একাঙ্ক নাটকের মত উর্দ্ধমুখী হয়ে climax স্তরে উন্নীত হয়েছে। স্টুডিবেকারে কাঙালির পা চাপা দেওয়ার কাহিনীর দিক থেকে exposition হিসেবে গণ্য হতে পারে। হালদার কর্তার মৃত্যু, 'দুধ মা' রূপে যশোদার নিয়োগপ্রাপ্তি, যশোদার 'দুধ মা' থেকে কাজের লোকে পরিণত হওয়া এবং সর্বশেষে স্তন ক্যানসারে যশোদার মৃত্যু কাহিনীর প্রধান প্রধান ধাপ (steps) হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। যশোদার মৃত্যু কাহিনীর উপসংহার রূপে বিবেচ্য। গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী কাহিনীকে ধাপে ধাপে শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে গিয়েছেন এবং সেই সঙ্গেই কাহিনীর সমাপতন ঘটিয়েছেন অসাধারণ কৃৎকৌশলের দ্বারা। গল্পের কাহিনীভাগ গড়ে উঠেছে হাউ-ই'র মতো। ছোটগল্পের singleness of aim and singleness of effect এখানে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নির্মাণ কৌশলে 'স্তনদায়িনী' গল্পের কাহিনীর বুনন সার্থক। তবে গল্পের গতিময়তা খুব ধীর। অবশ্য গল্পকার অনুভব করে থাকবেন এই গতি শৈথিল্যের কথা। তাই তিনি বলেছেন—"যশোদার জীবনকথা বলতে বসে বারংবার বাই-লেনে ঢোকার অভ্যেস ঠিক নয়। পাঠকের ধৈর্য কিছু কলকাতার পথঘাটের ফাটল নয় যে দশকে দশকে বেড়ে চলবে।"

'স্তনদায়িনী' গল্পের একমাত্র প্রধান চরিত্র যশোদা। গল্পের সূচনা ভাগে তাকে তিন সন্তানের জননীরূপে দেখা যায়। গল্পের সমাপ্তিতে সে কুড়ি সন্তানের জননী। যশোদা কাঙালিচরণের স্ত্রী। গল্পে তাকে একাধিক ডাইমেনশন্ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা গিয়েছে, তবে আশ্চর্যজনক ভাবে তার শরীরী-মাহাত্ম্য গল্পের প্রায় আগাগোড়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। যশোদার শৈশবের খবর পাঠক জানতে পারে না। আসলে যশোদাদের শৈশবেই যৌবন এবং যৌবনেই মাতৃত্ব এসে মাতৃত্বকালটাকেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে। মহাশ্বেতা দেবীর যশোদা তাই আজন্ম কাঙালিচরণের বই হয়েই যেন সার্থক। অল্প বয়সে যশোদার বিয়ে হয়ে যায়। যশোদার শরীরী আকর্ষণে কাঙালি নিরন্তর পিতৃত্ব লাভ করে গিয়েছে এবং যশোদা হয়ে উঠেছে প্রফেশন্যাল মাদার। এই "যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে রমণীর যুক্তিবুদ্ধি-বিচারহীন স্বামী ভক্তি, ও সন্তানপ্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা, সতী-সাবিত্রী সীতা থেকে শুরু করে নিরূপা রায় ও চাঁদ ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন।"

যশোদার স্বামী কাঙালি অকাল পঙ্গুত্ব লাভ করলে শিশু সন্তানদের কথা এবং কাঙালির কথা চিন্তা করে যশোদার মধ্যে স্বামী-সন্তানবৎসল ভাব জেগে ওঠে। সে হয়ে

Scanned by CamScanner

ওঠে হালদার বাড়ির 'দুধ মা'। স্বামী-সন্তানের ক্ষুন্নবৃত্তির জন্য 'দুধ মা'র জীবিকা গ্রহণ বাঙালি জীবন বা ভারতীয় জীবনেও দুর্লভ। নারীকে নানান কারণে সমাজ নিন্দিত পথে গিয়ে পতিতাবৃত্তির আশ্রয় নিতে দেখা যায় আমাদের সমাজ ইতিহাসে কিন্তু অপরের সন্তানকে বুকের স্তন্যপান করানোর যে জীবিকা যশোদা গ্রহণ করেছিল তা পুরুষতন্ত্রের নির্মম রূপটিকেই প্রকটিত করে। হালদার বাড়ির লোকেরা সামন্ততান্ত্রিক ঘরানায় নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করে, যদিও যশোদা হালদার বাড়ির সামন্ততান্ত্রিক শোষণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। যশোদা বরং উল্টোদিক থেকে হালদার গিন্নীর প্রতি সহৃদয় আন্তরিকতা প্রদর্শন করে 'দুধ মা' হতে পারার জন্য। যশোদার নিজ-উপার্জনক্ষম এই নবজীবন তার স্বামী কাঙালির নিকট কী ধারণা বয়ে এনেছে তা স্পষ্ট হয়ে যায় কাঙালির কথাতে, "পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। ...নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি...।" এই ভাবে যশোদা আপাতঃ সুখেই ছিল, যা তাকে অ-সুখের দিকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে গেছে। যশোদার স্তন্যে লালিত হতে থাকে হালদার বাড়ির নবজাতকরা, হালদারবাড়ির নবজাতকদের 'দুধ মা' হতে গিয়ে যশোদা তিন সন্তানের জননী থেকে কুড়িটি সন্তানের জননী হয়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে। যশোদার জীবনের দ্বিতীয়পর্ব কেটে যায় 'দুধ মা' হওয়ার আনন্দ-আপ্যায়ণে।

যশোদার জীবনের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্বের সূচনা হয়ে যায় হালদার গিন্নীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। হালদার বাড়ির লোকজন তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, কাঙালি ও তার দায়িত্ব নেয় না। অগত্যা যশোদাকে 'দুধ মা' থেকে কাজের লোকে পরিণত হতে হয়। যশোদার 'দুধ মা'-র গর্ব এবং গৌরব আর থাকে না। তাকে হালদার বাড়ির ঝি-চাকরের সঙ্গে থাকতে হয়। এসব যশোদার জীবনে ছিল অভাবিত। ইতিপূর্বেই হালদারবাড়ি এবং কাঙালির নিকট যশোদার প্রয়োজন ফুরিয়ে ছিল। আসলে যশোদার মা হবার ক্ষমতাটাই লক্ষ্মী ছিল, এই ক্ষমতা খতম হতেই যশোদার জীবনে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার, এত দুর্গতি। যশোদার বড় একা লাগতে শুরু করে। তার এখন না আছে কাঙালির আশ্রয়, না রয়েছে হালদার বাড়ির আদর-আপ্যায়ন, না রয়েছে স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ। যশোদা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু বিধি বাম, তাই সে নিজেকে শেষ রক্ষা করতে পারে না। সে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়, তার স্থান হয় হাসপাতালে। যশোদা হাসপাতালে যেতে গররাজি ছিল কারণ কুড়িটি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাকে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়নি, তাই আজও সে সাধারণ রমণীসুলভ আড়ষ্ঠতা থেকেই ডাক্তারের কাছে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। অসুস্থ যন্ত্রণাকাতর যশোদাকে হালদার বাড়িতে দেখতে আসে কাঙালি। যশোদা তাদের যৌবনের প্রথম-দাম্পত্যজীবনের আনন্দ স্মৃতির কথা স্মরণ করে, উপলব্ধি করে "দুধ দিলে মা হয়, স-ব মিছে কতা! না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উঁকি মেরে এট্টা কথা শুধোয়।' যশোদার এরূপ উপলব্ধি তার জীবন নির্যাস মাত্র। সে জীবন-যৌবন মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি শিশুর 'ফীড্' করেছে, আজ তারা কেউ-ই যশোদার ধারে কাছে আসে না। যশোদার গর্ভজাতরা ইতিমধ্যে যশোদাকে বিস্মিত হয়েছে, কাঙালিও যশোদার

Scanned by CamScanner

পরিনাম শুনে তাকে অকণ্ঠে বাদ দিয়েছে।

যশোদা হাসপাতালে একাকী, জগৎ-জীবনে যশোদা এখন নিতান্ত একাকী হয়ে নিজেই মৃত্যুর দিন গোনে। প্রায় অচেতন-যন্ত্রণাকাতর যশোদা নিজ অবস্থার কথা ভাবে, "কী দুর্গন্ধ, কী বেইমানি? এই স্তনকে সে ভাতের জোগানদার জেনে নিয়ত গর্ভ ধরে দুধে ভরে রাখত। স্তনের কাজই দুধ ধরা। কত গন্ধ সাবানে স্তন মেজে পরিষ্কার রাখত, বড্ড ভারি ছিল বলে জামা পরেনি যৌবনেও।" এই অতীত বর্তমানের অনুভূতির অতল তলায় তলিয়ে যায় যশোদা, মৃত্যু তার কাছে আলিঙ্গন নিয়ে আসে নির্বিরোধে। যশোদা মৃত্যুর মুখোমুখি, তার অন্তরজাত শেষ অনুভূতি, "বিশ্ব সংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?" এই একান্ত নিরুত্তর-জিজ্ঞাসা রেখেই রাত এগারোটায় যশোদা মারা যায়।

'স্তনদায়িনী' গল্পের মূল ভাবনা গড়ে উঠেছে যশোদাকে ঘিরে। গল্পকারের নারী প্রধান ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'স্তনদায়িনী'র যশোদা অন্যতম। গল্পকার অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে যশোদার নির্মম পরিনাম অঙ্কন করেছেন। গল্পকার নিজেই বলেছেন "স্তনদায়িনী'র যশোদাকে পশ্চিমবঙ্গ মনে করে লিখেছি।" গল্পকারের এই মন্তব্যে যশোদা পাঠকের নিকট এক ভিন্ন স্বাদের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। শরৎ সাহিত্যের মাতৃত্বের সঙ্গে যশোদার সাদৃশ্য আমরা খুঁজে পাই না। গল্পের শেষাংশে যশোদা যেন দেবীত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। "যশোদার মৃত্যু ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে সবাই তাকে ত্যাগ করে এবং একা মরতে হয়। মাতৃত্ব এখানে পণ্যের স্তরে নেমে এসেছে।" পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী শোষণের এমন নির্মম রূপ মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বে কাউকে অঙ্কন করতে দেখা যায়নি। "স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন মহিলা- যে তাঁর পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সমাজকে জীবনের শেষ স্বেদবিন্দু দিয়ে সেবা করে গেলো সে আর কি প্রতিদান প্রত্যাশা করে!" গল্পকার যশোদার প্রতিবিম্ব অঙ্কনে সমাজের প্রতি তাঁর আত্মিক বিদ্রুপ প্রকাশ করেছেন। যশোদা নামের মধ্যে একটি পৌরাণিক ব্যঞ্জনা রয়েছে, যা পাঠক মাত্রেই অবগত রয়েছে। পৌরাণিক যশোদা থেকে আধুনিক বিশশতকীয় যশোদার নির্মম জীবনালেখ্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। পৌরাণিক যশোদা কৃষ্ণকে প্রতিপালন করেছিল কিন্তু একালের যশোদা হালদার বাড়ির অসংখ্য নবজাতকের 'দুধ মা', মৃত্যুকালে একালের যশোদা একান্ত একাকী। এই জীবনচিত্র অঙ্কনে পৌরাণিক যশোদার থেকে একালের যশোদা অনেক বেশি জীবন্ত এবং বাস্তব। গল্পকারের অন্তরের সহচর্যে এই যশোদা সার্থক এবং বিরলতম এক নারী-মাতৃত্বের প্রতীকী অভিব্যঞ্জনায় কালোত্তীর্ণতা লাভ করেছে।

'স্তনদায়িনী' গল্পের অপ্রধান চরিত্রগুলি হল— কাঙালি, হালদার কর্তা, হালদার গিন্নী, হালদার বাড়ির ছোটছেলে, নবীন পাণ্ডা, লেডি-ডাক্তার, সরলা ধাই, হালদার বাড়ির মেজো ছেলে, হালদার বাড়ির বড় ছেলে, বড় বউ, গোলাপি এবং হাসপাতালের ডাক্তার।

Scanned by CamScanner

এরা প্রত্যেকেই গল্পে খুব সামান্য স্থান পেয়েছে কিন্তু এদের স্বল্পকালীন উপস্থিতি যশোদার জীবনকে নিয়তি-তাড়িত পরিনামের দিকে প্রধাবিত করেছে। যশোদার নির্মম-পরিনাম-নিশ্চিৎ করণে এদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এছাড়াও এদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নির্লজ্জ মুখোশ খুলে গিয়ে নারী-নিষ্পেশনের ভয়াল রূপটি উন্মোচিত হয়ে পড়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। যশোদার স্বামী কাঙালি, জাতিতে ব্রাহ্মণ, অর্থনীতির নিরিখে নিম্নবৃত্তীয়। 'স্তনদায়িনী' গল্পের নায়িকা যশোদার সমান্তরালে কাঙালিচরণ পতিতুন্ডআগাগোড়া প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্থান করে নিয়েছে। গল্পে কাঙালির সহায়-সম্বল, উপার্জন, জীবন-জীবিকা ততটা গুরুত্বলাভ করেনি; সে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যশোদার প্রতি আচরণে, মনোভাব পোষণে। স্বল্প পরিসরে হলেও এই গল্পে কাঙালিকে তিন ভাবে পাওয়া যায়। পা ভাঙার পূর্বে কাঙালি হতদরিদ্র বাঙালি ব্রাহ্মণ, স্ত্রী যশোদার প্রতি তার অমোঘ আকর্ষণ। এই আকর্ষণের পরিণামে যশোদার কখনো মনে পড়ত না, "কবে তার গর্ভে সন্তান ছিল না, মাথা ঘুরত না সকালে, কাঙালির শরীর কুপি জ্বালা আঁধারে তার শরীরকে ভু-তাত্ত্বিকের মতো ড্রিল করত না।" —এই হল কাঙালির পত্নী প্রেমের স্বরূপ এবং পরিনাম। সে সারাদিনই যশোদার শরীর-কেন্দ্রিক ভাবনায় মশগুল থাকতো, তাই বাবুদের স্টুডিবেকার তার পায়ের পাতা চাপা দিতে পেরেছিল অতি সহজেই। কাঙালির পত্নীর-শরীরী প্রেমের স্বরূপ গল্পকার নির্মোহভাবে তুলে ধরেছেন। "দুপুর নাগাদ পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্যভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালিচরণ অদূর সুখের কথা ভাবছিল এবং স্ত্রীর সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে সে স্বর্গসুখ পাচ্ছিল।.... এহেন সময়ে বাবুদের ছেলে স্টুডিবেকার সমেত ঘ্যাঁক করে কাঙালিচরণকে বাঁচিয়ে তার পায়ের পাতা ও গোড়ালির ওপরের গোছ দুটি চাপা দিল।" এই পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহকে কাঙালির জীবনের প্রথমার্দ্ধ বলা যেতে পারে।

এই কাঙালি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে কিন্তু পায়ের পাতা ফেরৎ পায় না। সে এখন ক্রাচ নিয়ে চলতে শুরু করে কিন্তু নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করতে দ্বিধা করে না। অন্যদিকে হালদারবাবু তার দোকান করে দেবে এই কথা শুনে তাকে দারুন আনন্দিত হতে দেখা যায়। হালদারবাবু তার প্রতি যেরূপ প্রসন্ন হয়েছে তা কাঙালির কাছে মায়ের কৃপা বলে অনুমিত হয়। তবে হালদার কর্তা মারা গেলে কাঙালি আতান্তরে পড়ে কিন্তু এই বিপদ থেকে যশোদা-ই তাকে রক্ষা করে হালদার বাড়ির 'দুধ মা' হয়ে। ইতিপূর্বে কাঙালি তিনটি সন্তানের পিতা হয়েছিল, যশোদা 'দুধ মা' হবার পর কাঙালি ক্রমান্বয়ে সতেরটি সন্তানের পিতা হয়েছে। যশোদা হালদার বাড়িতে আশ্রয় নিলে কাঙালি গোলাপির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই কাঙালিকে চিনতে অসুবিধে হয় না। কাঙালি হল সেই জাতের পুরুষ যে কুড়িটি সন্তানের পিতা হয়েও স্ত্রী অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে দ্বিধাবোধ করে না। কাঙালি হল নারী-শরীর সর্বস্ব পুরুষ, তার মধ্যে মূল্যবোধের সামান্য প্রতিফলন দৃষ্টিগোচর হয় না।

Scanned by CamScanner

কাজ হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই। যশোদা তার কাছে ফিরে এলে কাঙালি যশোদাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। সে অসুস্থ যশোদাকে বাধ্য করেছে হালদার বাড়িতে ফিরে যেতে। অসুস্থ যশোদাকে দেখে সে মেকীপণা করে কাঁদতে শুরু করে। গোলাপি কাঙালিকে পরিত্যাগ করেছে এবং এর পরেই কাঙালি হালদার বাড়িতে অসুস্থ যশোদাকে বলেছে, "চ, তোরে আমি মাথায় করে রাখব।" গোলাপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলেই যশোদা আশ্রয় পায়নি কাঙালির কাছে কিন্তু গোলাপি না থাকার জন্য কাঙালি যশোদাকে মাথায় রাখার কথা ঘোষণা করেছে। এর থেকে বোঝা যায়, কাঙালি কেবল নারীসঙ্গ, নারীর শরীর কামনা করে— তা সে যশোদা হোক বা গোলাপিই হোক না কেন। কাঙালির এ ব্যাপারে কোনো বাছবিচার রয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। তবে গল্পকার কাঙালির অন্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, "যশোদার ক্লিষ্ট, শীর্ণ কাতর চেহারা দেখে কাঙালির স্বার্থপর দেহ ও প্রবৃত্তির এবং উদরসর্বস্ব চেতনাও অতীত স্মরণে মমতা-কাতর হল।" এর পরেই কাঙালিকে ডাক্তারের কাছে কাঁদতে দেখা যায় কিন্তু ডাক্তার নেতিবাচক জবাব দিলে কাঙালিকে আর যশোদার জন্য ব্যাকুল হতে দেখা যায় না। অবশ্য কাঙালি আগেই মন থেকে যশোদাকে রিজেক্ট করে দিয়েছিল, ডাক্তারের নেতিবাচক উত্তর শুনে সে অকষ্টে যশোদাকে বাদ দিয়ে দেয়। এই কাঙালিকে যশোদার মৃত্যুর সময় যশোদার কাছে থাকতে দেখা যায় না এমনকি যশোদার শবদেহ দাহ করার সময় কাঙালি অনুপস্থিত থাকে। 'স্তনদায়িনী' গল্পে কাঙালির অনেকগুলি ডাইমেনশ্‌ন চলতে দেখা যায়, তবে মনুষ্যত্বের সাধারণ গুণাবলীর সমাবেশ তার মধ্যে দেখা যায় না। সে মনুষ্যত্বহীন নারী-শরীর লোলুপ জীবন্ত মাংসপিণ্ড মাত্র। কাঙালির থেকে শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া যায় না। তবে সে কল্পনা আরোপিত নয়, পরিকল্পিত নয়; সে জান্তব এবং জীবন্ত, এটাই কাঙালির চূড়ান্ত পরিচিতি।

'স্তনদায়িনী' গল্পের বৃহৎ পরিসর জুড়ে রয়েছে গোটা হালদার পরিবার। হালদার পরিবারের নারী-পুরুষ— দুই তিন প্রজন্মের সামন্ততান্ত্রিক নির্যাস গল্পকার খুব সুকৌশলে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপিত করেছেন। হালকর্তা-হালদার গিন্নিকে আপাতভাবে সহানুভূতিপ্রবণ সহৃদয়ী বলে ভ্রম হতে পারে কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে হালকর্তা এবং হালদারগিন্নির চূড়ান্ত স্বার্থপরতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। জীবনের লাভক্ষতির পাটিগানিতিক সূত্র এরা অতিক্রম করে না। কাঙালির প্রতি হালকর্তার সহানুভূতি এবং যশোদার প্রতি হালদার গিন্নীর সহৃদয়তা তাদের স্বার্থসর্বস্বতার নামান্তর মাত্র। যখন সামন্ততান্ত্রিক বিবেচনায় নিজেদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ পরিমানে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন হয়েছে তখনই কর্তা এবং গিন্নি উভয়েই অর্থব্যয়ে তৎপর হয়েছে। কর্তা-গিন্নির সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধ প্রজন্মক্রমে বড় বউ বা বাড়ির অন্যান্যদের মধ্যে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হালদার বাড়িতে যখন নবজাতকদের আবির্ভাব বন্ধ হয়েছে তখনই বাড়ির বড় বউ যশোদাকে বিদেয় করতে সচেষ্ট হয়েছে। হালদার বাড়িতে— 'দুধ মা' অপ্রয়োজনীয় হলে এবং যশোদা স্বামীগৃহে আশ্রয় না পেলে বড় বউ যশোদার জন্য পরিচারিকার জীবন নির্দিষ্ট করে দেয়। এভাবেই পড়তে পারা যায় হালদার বাড়ির শোষনের দলিল-দস্তাবেজ।

Scanned by CamScanner